ব্যক্তি আক্রমণের হোলি খেলা

জয়নাল আবেদীন

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের লোক হওয়ার পরও চিন্তা-চেতনা, কথা-বার্তা ও লেখনীতে আমাদের যে একটা চরমভাবাপন্ন ভাব প্রায়ই দৃশ্যমান তা নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এর সত্যিকার কারণ অন্বেষণ মনে হয় চমৎকার একটা গবেষণার বিষয় হতে পারতো। এ ব্যাপারে সত্যি তেমন কোন গবেষণা হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। তবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমি আমার এক শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুসম পত্রিকা সম্পাদক, যার পত্রিকায় বেশ আক্রমণাত্বক, গরম ও আপত্তিকর খবর মাঝে মাঝেই সংযোজিত হতো, তাকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম, আপনার এই মারমুখী, আক্রমনাত্বক ভূমিকার পিছনের শানে নযূল কি? অমায়িক হেসে, ভদ্রলোক উত্তর দিয়েছিলেন, সাধারণ লেখা পাবলিকে খায় না। বুঝলাম পাবলিককে খাওয়াতেই পাবলিককে আক্রমণ করার প্রয়োজন আছে। কি ভয়াহব, সর্বনেশে দর্শণ। আর একবার একজন বিশিষ্ট কলামিষ্ট যার লেখার গতি ও ছন্দ আমার ভাল লাগতো, তার লেখার আক্রমণাত্বক (যার বেশ কিছুটা ব্যক্তিগত আক্রমণ) ভঙ্গিটার দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে বিনীতভাবে প্রশ্ন রেখেছিলাম, ভাই এই জায়গাটায় একটু নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ছোঁয়া দেয়া যায় না। পরিতৃপ্তির একটা ঔজ্জ্বল্যে সমস্ত মুখমন্ডলকে উদ্ভাসিত করে মুচকি হেসে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আমাকে দিয়ে ভাই ওটা হবে না। নরম কথায় কোন কাজ হয় না। গরম লেখার ফলটা মনে হয় হাতে হাতেই পাওয়া যায়। ঐ যে পরবর্তীতে একটা পারিবারিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানে যখন লোকজনের সাথে দেখা হয় তখন তারা যে মিষ্টি হেসে কাছে এসে বলেন, ভাই/আপা আপনার লেখাটা পড়লাম । 'হেভি দিছেন, একেবারে শোয়ায়ে ফালাইছেন' তখনতো আর আনন্দ ধরে না। সাধারণ সব লেখায় এই আত্মতৃপ্তির সুযোগ কোথায়?

মানুষের জীবনের প্রত্যন্ত আঙিনায় অভিজ্ঞতার কি সীমাহীন মূল্য! অথচ কি মজার ব্যাপার, জীবনের দু'টো বেশ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, বিয়ে করতে বা লেখক হতে অভিজ্ঞতার কোন প্রয়োজন হয়না। প্রথম ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা থাকাতো রিতিমত গর্হিত হিসেবে বিবেচিত। এখানে আনাড়ির কদরই বেশী। ভুলের আনন্দ এখানে ফুলের সৌরভের চেয়েও অধিক প্রিয়। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে লেখক হতে প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন থাকারতো কথা নয়। যেখানে কথা বলা মানুষের জন্মগত অধিকার সেখানে লেখনীতো অনেক বেশী পরিশীলিত, সুন্দর ও চমৎকার একটা পন্থা। এখানে সময় নিয়ে নিজের কথাগুলোকে সাজিয়ে-গুছিয়ে, সুন্দর করে উপস্থাপন করার যে সুযোগ, প্রাত্যহিক জীবনে অহর্নিশি কথা-বার্তা, যুক্তি-তর্কে, অনুযোগ-অভিযোগ, বাক-বিতন্ডায় সেই সুযোগ কোথায়? লিখতে লিখতেই মানুষ লেখক হয়। লেখক হওয়ার প্রয়োজনীয় যে গুনাবলি তার অনেকটাই লেখার ভিতর দিয়ে নিজের অজান্তেই অর্জিত হয় এবং হবে । কিন্তু একটা জিনিষ যেটা লিখতে লিখতে অর্জিত হয়না সেটা হলো তার নৈতিকতা। লেখকের লেখার ক্ষমতা দিয়ে তার নৈতিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না বরঞ্চ এই নৈতিকতাই তার লেখনীকে নিয়ন্ত্রণ করে নিরন্তর। নিজের অজান্তেই তাকে দিয়ে যে কি লিখিয়ে নেয়, তা হয়েতো সে নিজেই জানে না । ফলশ্রুতিতে যে মাসুল তাকে গুনতে হয় তার মূল্য হয়তো শুধু ভুক্তভোগীই জানে। অত্যন্ত শক্তিশালী কোন লেখক, যার লেখার গতি, শব্দ

চয়ন, ছন্দ, উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে প্রথম সারির, তার লেখাতেও যদি নৈতিকতার স্খলণ, দিনতা আর হীনতা বিমূর্ত হয়ে উঠে তখন রিতিমত দুঃখ হয়।

প্রবাসে বসেও যারা কমিউনিটির বিবিধ কর্মকান্ডে জড়িত তাদের সবার জন্যই আমার আন্তরিক সাধুবাদ আছে। এদের মধ্যে শিল্পী আছে, লেখক-কবি-সাহিত্যিক আছে, বিদগ্ধ পাঠক আছে, মিডিয়া জগতের প্রতিভারা আছে, কমিউনিটি কর্মকান্ডের অন্যান্য শাখায় জড়িত ব্যক্তিবর্গ আছে। প্রবাস জীবনের প্রতিকুল পরিবেশে তাদের এই যে অবদান তা অনস্বীকার্য। হয়তো আত্মতৃপ্তির তাগিদ, নয়তো ভালো কিছু করার অভিপ্রায় বা অন্য কোন কারণেই তারা জড়িয়ে গেছে, জড়িয়ে আছে। তাদের অনেকেই হয়তো নির্দিষ্ট বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট সংযোজন নয়, তারপরও তাদের ঐ যে আন্তরিক প্রচেষ্টা, তার মূল্যওতো কম নয়। সর্বোৎকৃষ্ট সেবা প্রদানে অপারগ হলেও তাদের যতটুকু সাধ্য ক্ষমতায়, যেটুকুই তুলে ধরতে পারছে কমিউনিটির জন্য, সেটাও তো কম নয়। এরা কমিউনিটির জন্য কিছু করছে, অন্ততঃপক্ষে করার চেষ্টা করছে, যেটা আমি করছি না বা পারছি না, এই অনুভূতিটাওতো মানুষকে সহৃদয় হতে সাহায্য করতে পারে। আশার পরিধিটাকে একটু গুটিয়ে আনলেই তৃপ্তির সান্নিধ্যলাভ হয়তো সহজ হতে পারে।

তবে একটা কথা হয়তো সত্যি, এর মাঝে এমন দু'একজন আছে যাদের উন্নাসিকতা সহ্য করা বেশ কিছুটা কঠিন। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে এদের উপস্থিতি অনেকটা অনিবার্য । একটু সচেতন হলেই চেনা যায় এদের । সাধারণতঃ ভীড় বাঁচিয়ে সামান্য একটু দূরে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে তারা । কল্পিত চরম সফলতার পরম তৃপ্তিতে মুখমন্ডল উদ্ভাসিত । দৃষ্টি প্রসারিত সামনের দিকে। তাকিয়ে আছে সবার দিকে অথচ দেখছেনা কাউকেই । সবাই যেন তাকিয়ে আছে তারই দিকে, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে তেমনি একটা অভিব্যক্তি। এদের আশেপাশে দু'একজন জুটেও যায় কি কারণে? একটু কায়দা করে যদি এই দু'একজনকে এড়িয়ে যাওয়া যায় তাহলে সমস্যার আর কোন কারণ থাকে না। সুখের কথা, এই দু'একজন ব্যতিক্রমই শুধু, নিয়ম নয় কোন ক্রমেই।

কমিউনিটি কর্মকান্ডে যারা জাড়িত, তারা অবশ্যই কমিউনিটির কাছে, সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। তারা আমার জন্যে, আমাদের জন্যে কিছু করছে। আমাদের ভাল না লাগলে, খারাপ লাগলে সেটা জানিয়ে দেয়ার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে। সেই কোন ছোট বেলা থেকে রেডি শুনে আসছি আমরা । টিভি-রেডিওতে আঞ্চলিক ভাষায় কত গান, অশুদ্ধ ও আঞ্চলিক উচ্চারণের কত নাটক ও নাটিকা দেখেছি-শুনেছি। খারাপ লাগেনি। কিন্তু অনুষ্ঠান উপস্থাপক, ঘোষক বা ঘোষিকাকে কখনও ভুল উচ্চারণে, সীমাহীন জড়তায় অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে শুনিনি। অভ্যাসের বসে মানুষের মনে নিজের অজান্তেই মনে হয় একটা স্টান্ডার্ড তৈরী হয়ে যায়। এর বাইরে কিছু গ্রহণ করা তখন হয়তো সত্যি কষ্টকর। তাই সিডনীর বেশ কিছু বাংলা রেডিও চ্যানেলে যখন অশুদ্ধ উচ্চারণে, প্রস্ততিহীন নীচুমানের অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হয় তখন সাধারণের সেটা ভাল লাগার কথা নয়। এর বিপক্ষে প্রতিবাদ বা সমালোচনা আসতেই পারে এবং আসা হয়তো উচিৎ-ও। তাহলে হয়তো কর্তৃপক্ষ মান উন্নয়নে সচেষ্ট হবে। লাভবান হবে দু'জনই, উপস্থাপক, সেই সাথে শ্রোতাও । সিডনীর পত্র-পত্রিকা বা ওয়েব সাইটের অনেকগুলোরই বানানের মান যে যথেষ্ট উন্নত পর্যায়ের নয় সেটা অনস্বীকার্য। ছাপার অক্ষরে বানান ভুল এবং ভুলের আধিক্য লেখার মানকে অনেকটাই নামিয়ে আনার কথা। পাঠক

হিসেবে ব্যাপারটা আমাদের যেমন জানা, তেমনি সম্পাদকদের ও না জানার কোন কারণ নেই। এর পরেও মানুষের সীমাবদ্ধতা আছে, থাকবে। কেউ কেউ তো তার এই সীমাবদ্ধতার কথা সততার সাথে স্বীকারও করে। তারপরও এর বিপক্ষে প্রতিবাদ বা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ কোন অযৌক্তিক ব্যাপার নয়। এই অসন্তোষইতো উত্তরণের সোপান হবে, এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগাবে। তবে সেই প্রতিবাদ প্রকাশের নিম্নতম একটা মানের মনে হয় প্রয়োজন আছে।

গত সংখ্যার কর্ণফুলীতে 'বয়েজ অব বাংলাদ্যাশ!' নামে একটা কলাম পড়লাম। লেখার গতি ও ছন্দ নিঃসন্দেহে সুন্দর, অন্ততঃ আমারতো ভাল লেগেছে । রেডিওর কানটা মলে বাংলা অনুষ্ঠানগুলো খোঁজার বর্ণনাটা পড়ার পর, পুরো লেখাটা আর না পড়ার প্রশ্নই উঠেনা। এখন মনে হয়, পুরোটা না পড়লেই মনে হয় ভাল ছিল। প্রথম প্যারাটা পড়ার পর যদি শুধু লেখার শেষ বাক্যটা পড়ে শেষ করে দেয়া যেত, তাহলে মনে হয় বেশী ভাল হতো। শেষ বাক্যে লেখিকা লিখেছেন, *'আমরা চাই প্রবাসে ব্যক্তি-আক্রোশহীন ও শুদ্ধ উচ্চারনে 'আমরি বাংলা' ভাষার কিছু নির্মল শব্দ ও বাণী শুনবো... .....'*। অতীব চমৎকার নিষ্পাপ ও সুন্দর একটা অভিপ্রায়। কিন্তু এই অভিপ্রায়ে পৌঁছানোর আগের প্রতিটা পদে পদে তিনি যে পদাঙ্ক এই মাত্র রেখে এলেন তার সাথে এই শেষ বাক্যের সঙ্গতি কোথায়? ব্যক্তি আক্রমণের চিতামান বহ্নিশিখায় সমস্ত নগরীকে প্রজ্জ্বলিত করে, নিরোর মতো হাতে মোহন বাঁশী তুলে নিয়ে তাতে ব্যক্তি-আক্রোশহীন সমাজের সুমধুর সুর ফুটিয়ে তোলার যে প্রচেষ্টা, তা সত্যিই অভিনব।

সিডনী থেকে প্রচারিত রেডিও চ্যানেলগুলোর মান, উচ্চারণের দুর্বলতা, উপস্থাপনার জড়তা, ওয়েব সাইটের বানান ভুলের আধিক্যের ব্যাপারে যদি তার স্বিয় স্বিকৃত ব্যক্তি-আক্রোশহীন প্রতিবাদ থাকতো, তাহলে সেটা সাধারণে সাদরে সমাদৃত হতো বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু শুধু মাত্র ভুল উচ্চারণের প্রতিবাদে একজন উপস্থাপিকার ব্যক্তিগত জীবনকে টেনে এনে তাকে হেনেস্তা করার যে অভিপ্রায় এই লেখায় ফুটে উঠেছে, তা এক কথায় নৈতিকতার স্খলন, লজ্জাষ্কর। আর একজন উপস্থাপক সমালেচিত হয়েছে, দিনে বিড়াল, রাতেও বিড়াল থাকে, বাঘ হয় না বলে। তার রাতে বাঘ হওয়া না হওয়ার সাথে আমাদের কি সম্পর্ক আছে বোধগম্য হয়নি মোটেই। এই ধরণের অশালীন, কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের জন্য লেখিকার মাথা যথার্থই হেট হওয়াই উচিৎ।

জীবনের একটা অতি প্রচলিত সাধারণ দর্শণ আমার খুব প্রিয়। *আমি যে কি জানিনা তা বেশীর ভাগ সময়ই আমার অজানা*। জানার পরিধি যতটুকু বাড়ে, না জানার দিগন্ত মনে হয় ততই প্রসারিত হতে থাকে। *'যত জানি তত জানিনে..হে/'* । তার উপর যতটুকু জানি তার সবটুকু যে ঠিকমতো জানি তারই বা নিশ্চয়তা কতটুকু? এই বোধটুকু যদি সার্বজনীন হতো তাহলে মনে হয় অনেক সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব ছিল।

আমি একজন পাঠক। লেখার চেষ্টা করি মাঝে মাঝে । আমার লেখায় বানান ভুল হয়। তার কিছু আমার জানা, অসাবধানতার ভুল । বার বার পড়তে থাকলে যেগুলো শুদ্ধ করা সম্ভব। আর কিছু আছে অজানা ভুল। যে ভুলটা যে ভুল সেটাই আমার জানা নেই। এই ভুলটা সংশোধন করা কঠিন । সচেষ্ট হলে হয়তো উন্নতি হবে, সেটা কতদিনে হবে, কতটা হবে, জানিনা। তবে এই আমি ও নিঃসন্দেহে চাই পত্রিকার পাতায় যখন ছাপার অক্ষরে কোন কিছু উপস্থাপিত হবে, তা যেন সঠিক ভাবে যথার্থ বানানে উপস্থাপিত হয় । পত্রিকার সম্পাদক ও

নিশ্চয়ই সেটাই চায়। তারপরও যখন চাওয়া-পাওয়ার মাঝে বিস্তর দূরত্ব দেখি তখন বুঝি এই সীমাবদ্ধতার কষ্ট। এর বিপক্ষে একজন সম্পাদককে (যার পত্রিকাতে ছাপানোর জন্য লেখাটা পাঠান হচ্ছে) 'অক্ষরজ্ঞান-শূন্য প্রধান সম্পাদক' হিসেবে উল্লেখ করে তাকে ছোট করার প্রচেষ্টা ঠিক কতটা শালীন সেটাও আমার বোধগম্য হয়নি। তবে নিজের সম্পর্কে তিক্ত সমালোচনা ও অশালীন মন্তব্যের যে সাহসী ও 'আনকাট' উপস্থাপন কর্ণফুলী সম্পাদক দেখিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। সমালোচনা সহ্য করার এই চমৎকার ক্ষমতাই হয়তো একদিন তার উন্নয়নের সোপান হবে।

তবে এই প্রসঙ্গে সম্পাদক/সম্পাদকদের কাছে আমার একটা বিনীত জিজ্ঞাসা আছে। সম্পাদনার সাথে জড়িত থাকলে লেখাতো আসবেই। লেখার দায়িত্ব লেখকের, সেটা তার ব্যক্তি মানসের প্রতিচ্ছবি। সেটা পত্রিকায় যাবে কিনা, যাওয়ার যোগ্যতা রাখে কিনা, গেলে কিভাবে যাবে, কতটুকু যাবে তা নির্ণয়ের ভারতো মনে হয় সম্পাদকের । একটা নৈতিকতা বিবর্জিত লেখা যখন পত্রিকার পাতায় ছাপা হয়, তখন তার দায়-দায়িত্ব থেকে সম্পাদক সাহেব কতটা মুক্ত?

পরিশেষে বানান ভুল এবং উচ্চারণের ব্যাপারে যার মন এত সংবেদনশীল সে তার নিজের লেখার বিষয়ে কতটা যত্নশীল সেটা খেয়াল করার লোভ সামলাতে পারিনি। আমার অনুসন্ধানের পান্ডুলিপি এই সঙ্গে সংযোজিত হলো। উদ্দেশ্য কাউকে খাটো করা নয় (আমি জানি আমার নিজের এই লেখায়ও অনেক বানান ভুল আছে) বরঞ্চ আত্মপোলব্ধি এবং নমনীয় হতে সাহায্য করা। যার লেখার হাত এত সুন্দর তার কাছ থেকে ব্যক্তি-আক্রোশহীন, বক্তব্য-আক্রমণযুক্ত নতুন লেখার প্রত্যাশা থাকলো।

জয়নাল আবেদীন, সিডনী, ১১/০৮/২০০৬, Email # jabedin@aapt.net.au

লেখক জনাব জয়নাল আবেদীন গত সংখ্যায় ছাপানো 'সকিনা খাতুন' এর লেখার বানান ভুল যেভাবে ধরেছেন তা দেখার জন্যে এখানে টোকা মারুন।